দৈনিক নয়া দিগন্ত

দুই সহস্রাধিক ঋণখেলাপি   উচ্ছেদ অভিযান শেষ না হতেই নদী দখলের চেষ্টা

ঢাকা, সোমবার, ৬ জুলাই ২০০৯, ২২ আষা ১৪১৬, ১২ রজব ১৪৩০

- প্রথম পাতা
- শেষের পাতা
- দ্বিতীয় পাতা
- পনের পাতা
- সম্পাদকীয়
- উপ-সম্পাদকীয়
- নগর-মহানগর
- বাংলার দিগন্ত
- ক্রীড়া দিগন্ত
- অর্থ শিল্প-বাণিজ্য
- অন্য দিগন্ত
- আজকের কম্পিউটার
- চিঠিপত্র
- নিত্যদিন
- বিনোদন সারাদিন
- সিলেবাস
- মুক্তবাজার
- বিভাগ পরিক্রমা

পুরনো পত্রিকা

জাস্টিস ডিলেইড ইজ জাস্টিস ডিনাইড

ডা. ওয়াজেদ এ খান

‘জাস্টিস ডিলেইড ইজ জাস্টিস ডিনাইড’ অর্থাৎ বিচার প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করা প্রকারান্তরে বিচারকার্যকেই অস্বীকার করা। যুগে যুগে ন্যায়বিচার বঞ্চিত ভুক্তভোগীদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত এই প্রবাদবাক্য কালের প্রবাহে ঘটনাপরম্পরায় মিলে যায় বারবার। বিচারের বাণী নীরবে-নিভৃতে কাঁদে। পার পেয়ে যায় অপরাধী। এসব যেন আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নিত্যদিনের ঘটনা। প্রসঙ্গটি উল্লেখ করছি বিডিআর সদর দফতর পিলখানায় ঘটে যাওয়া নারকীয় হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ও বিচারকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশের ইতিহাসে জঘন্যতম এ হত্যাকাণ্ডে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক সেনাবাহিনীর চৌকস অফিসার ৬৪ জনকে হত্যা করা হয়েছে নৃশংসভাবে। সেনাবাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনী বিডিআরকে কৌশলে দাঁড় করানো হয়েছে পরস্পরের প্রতিপক্ষ হিসেবে। মর্মান্তিক এ ঘটনায় শুধু প্রাণ ও সম্পদহানি ঘটেনি, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাব্যবস্থাও হুমকির সম্মুখীন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে অনেক রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু পিলখানা হত্যাকাণ্ডের মতো এতটা মর্মস্পর্শী ও হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়নি কখনো। সহকর্মী কর্মকর্তাদের হত্যা এবং তাদের পরিবারের ওপর চালানো পাশবিক নির্যাতন সেনাবাহিনীর আবেগ-অনুভূতিতে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। সাধারণ মানুষকেও তা ব্যথিত ও আপ্লুত করেছে সমভাবে। তাই সেনাবাহিনী ও দেশবাসীর দাবি ছিল অতি দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে সত্যিকারের অপরাধী এবং তাদের ইন্ধনদাতাদের শনাক্ত করে বিচারের সম্মুখীন করার। ঘটনার গভীরতা ও ভয়াবহতা উপলব্ধি না করেই প্রধানমন্ত্রী প্রথমে হত্যাকারীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। পরে তদন্তসাপেক্ষে দ্রুত বিচারকার্য সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ঘটনার পরপরই সরকারি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রধান করে। সমালোচনার মুখে পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাকে বাদ দিয়ে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা আনিস উজ্জামানের নেতৃত্বে ২ মার্চ গঠিত তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করে। এ কমিটির কয়েক ধাপে সময় বৃদ্ধির পর সর্বশেষ ২১ মে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়। লে. জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীকে প্রধান করে গঠিত সেনা তদন্ত কমিটি তাদের প্রতিবেদন পেশ করেছে ১০ মে।

ঘটনার পটভূমি ও কারণ উদঘাটন এবং প্রাসঙ্গিক সুপারিশ করার জন্য কর্মপরিধি সীমিত করে তদন্ত কমিটির হাত-পা বেঁধে দেয়ায় শুরু থেকেই সরকারি তদন্ত কমিটির কার্যকারিতা নিয়ে দেখা দেয় সন্দেহ, অবিশ্বাস ও বিভ্রান্তি। হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের খুঁজে বের করতে সেনাবাহিনী তাৎক্ষণিকভাবে অপারেশন রেবেল হান্টের ঘোষণা দিলেও অজ্ঞাত কারণে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে তদন্ত কমিটি গঠন প্রক্রিয়া এবং সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত নিয়ে বিতর্ক ছিল শুরু থেকেই। তদুপরি অহেতুক কালপেক্ষণে ক্রমান্বয়েই সৃষ্টি হল ধূম্রজাল। দীর্ঘ দুই মাস ২০ দিন পর জমা দেয়া এ তদন্ত প্রতিবেদনের ফলাফলে তাই স্বভাবতই মিলছে না সেনাবাহিনী ও জনগণ কর্তৃক উত্থাপিত স্পর্শকাতর প্রশ্নগুলোর উত্তর। তদন্ত রিপোর্ট আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে যেসব তথ্য-উপাত্ত বেরিয়ে এসেছে তাকে পর্বতের মূষিক প্রসব বলে মন্তব্য করেছেন অভিজ্ঞজন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে প্রতিবেদনের যে অংশ প্রকাশ করা হয়েছে সেটুকুও স্ববিরোধিতায় পূর্ণ। প্রতিবেদনে জঙ্গি ও রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা খুঁজে না পাওয়ার কথা উল্লেখ করা হলেও পরক্ষণেই দায়ী করা হয়েছে বিএনপি'র সাবেক সংসদ সদস্য নাসিরউদ্দীন আহম্মেদ পিন্টুকে। পলাতক বিডিআর জওয়ানদের খেয়া পারাপারে সাহায্য করার অভিযোগে গ্রেফতার করে তাকে নেয়া হয়েছে রিমান্ডে। চেষ্টা চলছে বিএনপি'র আরো কয়েকজন নেতাকে ফাঁসানোর। আদালতে প্রদত্ত বিদ্রোহী জওয়ানদের জবানবন্দীতে সরকারদলীয় যেসব মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যের নাম উঠে এসেছে, তারা থেকে গেছেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা তোরাব আলী গ্রেফতার হওয়ার পর 'হারিয়ে গেছেন চোরাবালিতে'।

সরকারি তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের সাথে সেনা তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন সাংঘর্ষিক হতে পারে আঁচ করে মন্ত্রীদের কেউ কেউ কড়া মন্তব্য এবং কট্টর সমালোচনা করেছেন সেনা তদন্ত প্রতিবেদনের। সরকারি তদন্ত প্রতিবেদনের ৩০৯ পৃষ্ঠার মধ্যে রয়েছে ৫৭ পৃষ্ঠার মূল প্রতিবেদন। হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সেনা আইনে দ্রুত বিচারসহ পেশ করা হয় ১২ দফা সুপারিশ। এ প্রতিবেদনে ডাল-ভাত কর্মসূচিসহ বিডিআর সদস্যদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও দাবিদাওয়াকে বিদ্রোহের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও তদন্ত কমিটি উদঘাটন করতে পারেনি হত্যাকাণ্ডের সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ। খুঁজে পায়নি জঙ্গি ও রাজনৈতিক কানেকশন। তদন্ত কমিটিগুলোর সমন্বয়কারী বাণিজ্যমন্ত্রী ফারুক খান বলেছেন, বিচারকাজ শুরু থেকে আরো দু-তিন মাস লাগবে। সব কিছু মিলিয়ে সংশয় ও সন্দেহের পাশাপাশি প্রশ্ন উঠেছে সরকারি তদন্ত প্রতিবেদনের নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে। বিশেষ করে শুরু থেকেই এ ঘটনায় সরকারি দলের কিছু মন্ত্রী-এমপি'র সম্পৃক্ততার কথা ফাঁক হয়ে যাওয়ায় বারবার হোঁচট খেয়েছে তদন্ত কার্যক্রম। অপর দিকে সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দল থেকে অভিযোগ উঠেছে মূল ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে আসল অপরাধী ও তাদের মদদদাতাদের আড়াল করার অপচেষ্টার। এ জন্যই নাকি সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বাতিল, সেনানিবাসের বাড়ি থেকে বেগম খালেদা জিয়াকে উচ্ছেদ এবং সর্বশেষ ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলার মতো বিষয়গুলোকে একের পর এক সামনে নিয়ে আসছে। এভাবে উত্তপ্ত করতে চাচ্ছে রাজনীতির ময়দান। স্পর্শকাতর পিলখানা হত্যাকাণ্ডের চেয়ে পাঁচ বছর আগের ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলার ইস্যুটিই এখন অধিক প্রাধান্য পাচ্ছে সরকারের কাছে। ওই ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার (এনএসআই) সাবেক মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) এম আব্দুর রহিম এবং প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদফতরের (ডিজিএফআই) তৎকালীন পরিচালক মেজর জেনারেল (অবঃ) রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরীকে। গোয়েন্দা সংস্থার শীর্ষ এই দু'জনকে নেয়া হয়েছে রিমান্ডে। সিআইডি'র কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদে তারা কী উত্তর দিচ্ছেন, তার ফিরিস্তি পত্রিকায় দেখে মনে হচ্ছে এখানে গোপনীয়তা বলে কিছু নেই। গ্রেফতারের ধারাবাহিকতা এবং স্বীকারোক্তি আদায় প্রক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে

ধাবিত করছে মামলাকে। রিমান্ড ও তদন্ত চলাকালে আসামির দেয়া বক্তব্য সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ায় কার্যত ন্যায়বিচারপ্রাপ্তি মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে মনে করছেন আইন-বিশেষজ্ঞরা। সরকারকে মনে রাখতে হবে, ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলা ইস্যুটি যদি ১০ জন মানুষের নজর কাড়ে, সে ক্ষেত্রে ১০ হাজার মানুষের দৃষ্টি নিবিষ্ট পিলখানার হত্যাকাণ্ডের ওপর। অন্য ইস্যু তৈরি করে সেখান থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র সরানো সম্ভব নয়।

জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে। ১০ ট্রাক অস্ত্র খালাসের ঘটনায় যদি এসব কর্মকর্তার ব্যক্তিস্বার্থ জড়িত থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা। আর যদি তা হয় রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট, তাহলে সমূহ সম্ভাবনা থেকে যাবে রাষ্ট্রের গোটা নিরাপত্তাব্যবস্থা ভেঙে পড়ার। এ ধরনের গ্রেফতারির রেওয়াজ সেনাবাহিনীর জন্য অশনি সঙ্কেতও বটে। ‘এক-এগারো’র পর কর্মরত ছিলেন ডিজিএফআই’র এমন একজন পরিচালক মেজর জেনারেল আমিনকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়েছে। ক্ষমতা চিরস্থায়ী কোনো বন্দোবস্ত নয়। আজ যারা পাঁচ বছর আগের ঘটনার জন্য সাবেক গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন, ক্ষমতার হাত বদলের কারণে পাঁচ বছর পর নতুন নতুন অভিযোগে তাদেরও বিচারের মুখোমুখি হতে হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এভাবেই সময় মানুষকে তাড়িত করে, পীড়িত করে অন্যের ওপর পীড়নকারীকে। ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলায় সার কারখানায় জেটি ব্যবহারের দায়ে যদি তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী ও মূল ঘটনার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দায়ী করা হয়, তাহলে পিলখানার ঘটনার দায় বর্তমান প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এড়াবেন কী করে?

এ দিকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সীমান্ত চৌকি থেকে বিডিআর সদস্যদের ঢালাওভাবে গ্রেফতার করা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিডিআর জওয়ানরা ভেঙে পড়েছেন মানসিকভাবে, ভুগছেন নিরাপত্তাহীনতায়। দেশের নিু ও নিুমধ্যবিত্ত পরিবারের এসব সদস্যের উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল তাদের পরিবার। ৬৭ হাজার বিডিআর জওয়ানের একজনের সাথে যদি গড়ে চারটি পরিবার জড়িত থাকে, তাহলে দেশের আড়াই লক্ষাধিক পরিবার আজ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় প্রহর কাটাচ্ছে। প্রায়ই জওয়ানদের ঘটছে অপমৃত্যু। হাজার হাজার জওয়ানকে গ্রেফতার করে রিমান্ডে পাঠিয়ে বিচারকার্য দ্রুত সম্পন্ন করা যাবে কি? মুষ্টিমেয় কিছু বিপথগামী জওয়ানের জন্য গোটা বিডিআর বাহিনীর খোলনলচে বদলে দেয়ার সরকারি প্রচেষ্টা বিচারকার্যকে আরো বিলম্বিতই করবে। পিলখানা থেকে এক হাজার ৩৯৪ জন এবং ঢাকার বাইরের ২৯টি জেলা থেকে এক হাজার ৫৮১ জন জওয়ানকে গ্রেফতার করা হয়েছে বিদ্রোহের ঘটনায়। তদন্ত প্রতিবেদনে হত্যাকাণ্ড ও বিদ্রোহের মূল পরিকল্পনার জন্য যে ৪০ জনকে দায়ী করা হয়েছে, তাদের অর্ধেকের বেশি এখনো পলাতক। বিডিআরপ্রধান মেজর জেনারেল মইনুল ইসলাম বলেছেন, ঢাকার বাইরে বিদ্রোহী বিডিআর জওয়ানদের ক্ষমা নেই। ঢাকার বিদ্রোহী জওয়ানরা প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত সাধারণ ক্ষমতার আওতায় পড়লে বাইরের জওয়ানরা কেন পড়বে না সরকারের এমন দ্বিমুখী নীতি বিচার প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে। তদন্ত প্রতিবেদন জমা হওয়ার পর এখনো নির্ধারিত সেনা আইনে না প্রচলিত আইনে ঘাতকদের বিচার হবে এবং বিচার শুরুর বিষয়টিও থেকে যাচ্ছে অনিশ্চিত। এভাবে কালক্ষেপণ প্রক্রিয়া চলতে থাকলে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির প্রত্যাশা ক্রমান্বয়েই ক্ষীণ হয়ে আসবে। আত্মবিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে যাবে গোটা জাতি। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদে উঠতে পারে এক সময়।

লেখক ঃ নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলাদেশ-এর সম্পাদক
weeklybangladesh@mindspring.com